সমাজ সংস্কারে বেগম রোকেয়া

নাছিমা বেগম

আমাদের সমাজ ও সাহিত্যাঙ্গনে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত। বেগম রোকেয়ার জন্ম উনিশ শতকের বাংলাদেশে। এসময় ভারতবর্ষে নারীদের বিশেষকরে মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম নারীদের পর্দার নামে কার্যত কঠোর অবরোধের মধ্যে বন্দি জীবন যাপন করতে হতো। শিক্ষার আলো তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। এমনই এক সময়ে একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজসংস্কারক হিসেবে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার অভিপ্রায়ে নারীর ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা। সেই সময়টাকে অনেকেই এদেশের নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের কাল বলে গণ্য করেছেন।

উনিশ শতকের বাংলায় অকল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। নবজাগরণের চেতনার প্রবর্তক বলে খ্যাত এই দুই মনিষীর সমাজ-সংস্কারের প্রথম উদ্যোগ ছিল নারীর অবস্থার উন্নতি। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধনে সফল হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাস করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১

হিন্দু নারী মুক্তি আন্দোলনে সে সময়কালের হিন্দু নারীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন মহিলা সমিতি-সংগঠন নারীর কল্যাণ ও শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেসময় বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর কল্যাণে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায় না। শুধু ভূপালের নবাব বেগম সুলতান জাহানের নেতৃত্বে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভূপালে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বাল্যবিবাহ, নারীর উত্তরাধিকার, স্ত্রীশিক্ষা, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। ২

কিন্তু তখনকার বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের শিক্ষার অবস্থা কী ছিল তা নিয়ে কেউ কিছু বলেননি। বাস্তবতা হলো শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুর তুলনায় এদেশের মুসলমান পুরুষেরাই তখন পিছিয়ে। মেয়েদের জীবন কাটাতে হতো কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যে। জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মতে, রোকেয়ার জীবনের প্রধানতম গৌরব হলো রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম হওয়ার পরেও তাঁর সমাজ সংস্কারের সচেতনতা ছিল অসাধারণ; তিনি এই পর্দাপ্রথার অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙতে পেরেছিলেন। ৩

সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে রোকেয়া নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা নিয়ে নারী সমাজকে জাগাতে চেয়েছিলেন। একদিকে তিনি ক্ষুরধার লেখনি চালিয়েছেন; অন্যদিকে নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" এর (অর্থাৎ প্রাণদন্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (অর্থাৎ ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছিত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ("but nevertheless it (Earth) does move")!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।" বেগম রোকেয়া তাঁর এই জাগ্রত চেতনা থেকেই ঘুমন্ত নারীদের জাগানোর জন্য বলেছিলেন, "অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!" ৪

রোকেয়ার ভাষায়, "স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।" এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য নারীকে কি করতে হবে? সে প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেছেন, "সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। এবং আমরা গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।"৫

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "পুরুষের সমক্ষমতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ-সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী'র" গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?" ৬

"বোরকা" প্রবন্ধে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে উল্লেখ করে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগন স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন।" এপ্রবন্ধে তিনি অন্যায় পর্দা ছেড়ে আবশ্যকীয় পর্দার পক্ষে থাকলেও তার মূল বক্তব্য ছিল উন্নতির জন্য অবশ্যই উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। তাঁর মতে শিক্ষার অভাবই নারীর স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায়। এপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএত শরীর- শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়।" তিনি "অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের" পক্ষে তার জোরালো অবস্থান তুলে ধরেন। ৭

বেগম রোকেয়ার উল্লিখিত উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুসলিম নারীমুক্তির প্রথম প্রবক্তা হিসেবে তিনি সুনিপুণ লেখনীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেছিলেন। নারীকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে নারীর শিক্ষা বিস্তারে তিনি গভীর অন্ধকারে শিক্ষার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদের গড়ে তোলার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে তিনিই প্রথম মুসলিম বালিকাদের জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পাশাপাশি মুসলিম নারীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন। মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে তাঁদের সামাজিক জীবন গঠন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে প্রথম 'মুসলিম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি 'Calcutta Mohamedan Ladies Association' নামেও পরিচিতি লাভ করে। বেগম রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল এই সমিতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে বিরাজমান ছিল, সেই পরিবেশে বালিকাদের জননীদের জন্য সমিতি গঠন করা এবং সভা সমিতির মাধ্যমে তাদের সমাজগঠনমূলক কাজে উৎসাহিত করা নিঃসন্দেহে বেগম রোকেয়ার অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। ৮

বেগম রোকেয়ার সহযাত্রী শামসুন নাহার মাহমুদের রচিত "রোকেয়া- জীবনী" গ্রন্থ থেকে এবিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। শামসুন নাহার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মৃত্যুর কিছুদিন আগে একদিন তিনি বেগম রোকেয়াকে বলেছিলেন, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের ঘটনাগুলো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বলেছেন, "আঞ্জুমানের কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।"

এ প্রসঙ্গে সব শামসুন নাহার মাহমুদ উল্লেখ করেছেন তাঁর দীর্ঘকালের জীবনে কী কী কাজ করেছেন তার বিবরণ আলোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী এ সমিতির নিকট হতে অর্থ সাহায্য পেয়েছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দারিদ্র কুমারী সৎপাত্রস্থ হয়েছে, বহু অভাবগ্রস্থ বালিকা শিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করলে তাঁর সম্পর্কে কার্যত কিছুই বলা হলো না। আজকের নারী সমাজের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে এই সমিতি দীর্ঘকাল লোক চক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজের নারীদেরকে আজীবন ঋণী করে রেখেছে। এই সমিতি গঠন প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদ লিখেছেন, "রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা-সমিতিতে যোগদান করিবেন একথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন।" তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "কোথাও হয়তো বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে রোষকাষায়িতলোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে যখন তিনি সভার নির্দিষ্ট তারিখে কোন আত্মীয়র গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন সঙ্গে পুটলিতে রহিয়াছে সভায় যোগদান করিবার উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃংখল কাটিবার চেষ্টায় রোকেয়া বছরের পর বছর অতিবাহিত করিয়াছেন।" ৯

বেগম রোকেয়ার শেষ জীবনে যখন শামসুন নাহার মাহমুদকে সমিতির কাজে হাত দিতে হয়েছিল, তখন একবার বাহির হতে অকারণে সামান্য বিরূপ সমালোচনা শুনে তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন, সে সময় বেগম রোকেয়া একটু হেসে তাঁকে বলেছিলেন, "যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা- গ্লানি, উপেক্ষা- অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্র-বিদ্যুৎ সকলেই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।" শামসুন নাহার উল্লেখ করেছেন, এই একটি মাত্র কথার মধ্যেই যেন এক নিমিষে তাঁর জীবনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই চিরদিন তাঁর গাত্রচর্ম ও মস্তকের আবরণে কেবলই আঘাতের পর আঘাত বর্ষিত হয়েছিল। উদগ্র কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই তাঁর চারিদিক ঘিরে চিরদিন দুর্ভেদ্য বর্মের মতো তাঁকে রক্ষা করেছে।

দীর্ঘকালের কুসংস্কারের আঁধারে আচ্ছন্ন মুসলিম নারী সমাজ এতোটাই অজ্ঞ ছিল যে, সমিতি কাকে বলে, সভা কাকে বলে- অনেক সময় সেটাও বেগম রোকেয়াকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট করে শেখাতে হয়েছে। তিনি একবার গল্পচ্ছলে শামসুন নাহারকে বলেছেন- অনেক সাধ্য সাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে একটি শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমানের এক মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিং শেষ হলে সমবেত মহিলারা গৃহে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এসময় নবাগতা মহিলা রোকেয়ার কাছে এসে জানতে চাইলেন, "সভার নাম করিয়া বাড়ির বাহির করিলেন কিন্তু সভাত দেখিতে পাইলাম না।" বেগম রোকেয়া অনেক কষ্টে ওনাকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে তখনই যে কাজটি শেষ হয়ে গেলো তার নামই সভা। রোকেয়া আরও বলেছেন, প্রত্যেকটি অধিবেশনের পর সভাকক্ষের দেয়াল গুলো পানের পিকে এমনভাবে রঞ্জিত হতো যে, প্রত্যেকবারই চুনকাম না করালে চলতো না। স্বয়ং সভানেত্রী হতে আরম্ভ করে সমাগত মহিলাদের মধ্যে কেহই অনুভব করতেন না, যে- সময় সভার কাজ চলছে, অন্তত সে সময়টুকু নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসে থাকা প্রয়োজন। সে যুগে তিনি কী ধরনের সভা করতেন তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। ক্রমে ক্রমে রোকেয়ার চারপাশে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হয়। ধীরে অতি ধীরে তারা বুঝতে পারলেন সভা সমিতি কাকে বলে, তারা দেখলেন নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছেছে। তারা এ দূরবস্থার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে শিখলেন। এক কথায় বলতে গেলে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুসলিম নারীর চক্ষু ফোঁটে। ১০

অনেক বাধা বিপত্তি মেনে নিয়ে বেগম রোকেয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতাকাল থেকে আমৃত্যু অবৈতনিক সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করে গেছেন। তিনিই ছিলেন সমিতির প্রাণ। যেকোনো মুসলমান মহিলা আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের সভ্য হতে পারতেন।

মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে একাত্মতা সদভাব ও পারস্পরিক সমঝোতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নিম্ন বর্ণিত কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করত:-

১. নিয়মিতভাবে মেম্বারদের মিটিং ডাকা। তাদেরকে একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধনের সুযোগ দেয়া এবং সমাজের কাজে তাঁদের প্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করা।

২. সমিতি নারীসমাজ সংক্রান্ত সমুদয় সমস্যা ও যাবতীয় প্রশ্নের আলোচনা করবে এবং সে বিষয়ে সভ্যগণ আপন মতামত ব্যক্ত করবে।

৩. সাধারণ সভাসমূহে শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়, নারী সমাজে কল্যাণকর প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, শিশু মঙ্গল, শরীরপালন, দেশ-বিদেশের নারী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা।

৪. সময় সময় ম্যাজিক- লণ্ঠনের সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সহজ ও মনোরম করে মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করার চেষ্টা করা।

৫. সমিতির সভ্যগন কর্তৃক দরিদ্র পল্লীসমূহে গিয়ে আর্ত ও পীড়িতদের প্রয়োজন মত যথাসাধ্য সাহায্য করা।

৬. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদিগকে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প-কর্ম ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে তার দ্বারা তাদের জীবিকা উপার্জনের সহায়তা করতে চেষ্টা করা এবং শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুসারে বাংলা বা উর্দু ভাষা সে সাথে ইংরেজি ও অংক প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

প্রতিবছর আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। উক্ত সম্মেলনে সংগঠনের কার্যাবলী ও হিসাব নিকাশের বিষয় তুলে ধরা হতো। প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রাঙ্গনে সমিতির বিভিন্ন কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হতো। নারী জাতিকে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলাই ছিল এই সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য। ১১

বেগম রোকেয়ার অন্যতম অনুসারী আনোয়ারা বাহার চৌধুরি যিনি ১৯৩৮-১৯৪৭ সময়কালে সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর মতে, "এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। এই সমিতি তখনকার দিনে কলকাতার মুসলিম মহিলাদের একত্র করে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী কি অসহায়, দুর্বল আর অজ্ঞ এ কথা বোঝাতে, শিক্ষা ছাড়া তাদের মুক্তি নেই, শিক্ষা না পেলে এ বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে না– পারবে না, তারা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় ও পূর্ণ করতে। ধর্ম তাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে কিন্তু অজ্ঞতা ও সংস্কারের বেড়ীতে তারা এমনি আবদ্ধ যে তারা তা জানেও না। প্রতি মাসে সমিতির সভা ডেকে, মহিলাদের একত্র করে প্রচার করা হতো এই জাগরনের বাণী।"১২

দেশ ও সমাজের স্বার্থে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের কার্যাবলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশীয় খেলাফত আন্দোলনের সময় বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে এই সমিতি দেশ ও সমাজের বহু কাজ করেছে। এ সমিতির সদস্যরা বাড়ির বাইরে এসে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে না পারেলেও মুসলিম মেয়েদের মাঝে স্বদেশী ভাব দ্বারা প্রচারে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সমিতির মহিলা সদস্যরা চরকা কেটে প্রচুর পরিমাণে সুতা তৈরি করে খদ্দর তৈরিতে সাহায্য করে এবং বিলেতি দ্রব্য বয়কটে সমিতির কর্মীবৃন্দ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। ১৩

বেগম রোকেয়া আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের মাধ্যমে নারীদের নিজের অধিকার সম্বন্ধে যে সচেতনতা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন– তার সফলতা সমসাময়িক মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হয়। বেগম রোকেয়ার বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে ক্রমে মুসলিম নারীসমাজ সমিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের উপর আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলামে'র প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। বেগম রোকেয়ার জীবনকালেই এই সমিতি একটি সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সমিতিরূপে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত সমিতি নারী কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়েছে।১৫

শামসুন নাহার 'রোকেয়া-জীবনী'তে উল্লেখ করেছেন, রোকেয়া আজ নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে- পতাকা তিনি এতোকাল উর্ধে তুলে ধরেছিলেন তা ধুলায় লুটিয়ে পড়েনি। তার বংশীধ্বনি শুনে যারা জেগেছিলেন তার অবর্তমানে তাদের কাজ হলো, তাঁর হাতের জয়পতাকা সাবধানে বহন করে নিয়ে পথ চলা। যে কাজটি নিয়ে অর্ধসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ করে তোলা। ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারীর প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে যে কর্মতৎপরতার পরিচয় দেয় তাতে দেশের নারী সমস্যা সমাধানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতা মহানগরীতে ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় নারী আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্থায়ী অক্ষরে লেখা থাকবে। আয়ারল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, রোমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, বিভিন্ন দেশের মহিলা কর্মীগণ সমগ্র নারী জাতির কল্যাণ-কামনায় সমবেত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি যথামর্যাদায় অংশগ্রহণ করে মুসলমান মেয়েদের কর্ম তৎপরতার পরিচয় দেন।

আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতির ইতিহাসের সাথে বেগম রোকেয়ার বিশ বছরের কর্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমিতির কাজে তাঁর অনুবর্তিগনকে যে পদে পদে বাধাবিঘ্ন জয় করে পথ চলতে হয়নি তা নয়; কিন্তু দেশের নারীচিত্রকে জাগ্রত করবার জন্য যিনি এত দীর্ঘ দিন আপনাকে তিলে তিলে ব্যয় করে গেলেন, যুদ্ধজয়ের সকল যশোভাগ তাঁরই প্রাপ্য।১৫

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের নারী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক
কমলা দাশগুপ্ত বেগম রোকেয়াকে 'বিপ্লবী' নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'অবরোধবাসিনী' পুস্তকে তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে বেদনাতুর চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী। প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসর সমাজের নারীদের মধ্যে দেশানুরাগ জাগাবার যে প্রচেষ্টা তিনি সারাজীবন ধরে করে গেছেন তার মূল্য কম নয়। ১৬

দেশের স্বাধীনতা চাইবার আগে রোকেয়া চেয়েছিলেন স্বদেশের নারী সমাজের স্বাধীনতা। সমাজে নারীর মর্যাদা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শুধুমাত্র আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের কর্মকাণ্ডের মাঝে তাঁর সমাজকর্ম সীমিত ছিল না। সমাজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে তিনি জীবনব্যাপী সমাজসেবা করে গেছেন। তিনি মুসলিম নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'Bengal women's education conference'- এর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নারীকল্যাণ বিশেষত নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও বিভিন্ন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের এক অধিবেশনে বেগম রোকেয়া সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

১৯২২ সালে ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থ' নামক অনাথ আশ্রমের কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া। পতিতা লাঞ্ছিতা নারীদের বিবিধ শিল্পকার্যাদি শিক্ষা দিয়ে তাদের পবিত্র ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ দেয়া ছিল এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী হিসেবে বেগম রোকেয়া বিভিন্ন সম্মেলনে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতেন। ১৯২৫ সালে বেগম রোকেয়া বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে আলীগড় শিক্ষা কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক আবুল ফজলের মতে, সে বছর আলীগড় শিক্ষা কনফারেন্সে মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য বোম্বের আতিয়া বেগমের নেতৃত্বে মেয়েরা যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, সেদিনও বাংলার মুখ রক্ষা করেছিলেন এই অপূর্ব মেয়েটি। পুরুষ নেতা ও অসংখ্য জনতার মধ্যে নির্ভীকচিত্তে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পুরুষের পক্ষপাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উপস্থাপন শেষে নিজের অধিকার ও হক আদায় করে নেওয়া কম পৌরুষের কথা নয়।১৭

রোকেয়ার আলীগড় সম্মেলনে যোগদান প্রসঙ্গে মরিয়ম রশিদকে লেখা তাঁর একটি পত্র এখানে প্রণিধানযোগ্য। সম্মেলনে অনেক মুসলমান গ্রাজুয়েট মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রোকেয়া চিঠিতে লিখেছেন, "তাহাদের সম্মুখে আমি কি মুখ খুলিতে পারি? কেহ তামাশা করিয়া সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার কথা লিখিয়া থাকিবে। আমি শিক্ষিত মহিলাদেরকে দেখিয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছি। আমার চক্ষু ধন্য হইয়াছে।" ---নারী কূলের সাহায্যে সমিতি গঠনের জন্য এক মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিয়েছিলেন। আলিগড়ের মেয়ে কলেজ শীঘ্রই ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। রোকেয়া আফসোস করে উল্লেখ করেছেন, "আর আমাদের বাংলাদেশ -আহারে! সে কথা না বলাই ভাল। আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম (ধর, মাত্র ২ লক্ষ) তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারতাম। কিন্তু খোদা আমাকে কোন টাকা দেন নাই। বলি, আমার বাংলাদেশ। যদি কিছু না-ই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস ত! সেজন্যও আর বেশি ভাবনা নাই - ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সে ভার লইয়াছে। আহা, বুক ফাটিয়া যাইতে চায়।

তোমার দুলার চিঠিও পাইয়াছি। তিনিও আমার বক্তৃতার জন্য মোবারকবাদ দিয়াছেন। আরে বোরকা ঢাকা অবস্থায় দু একটি কথা বলিয়াছি কি নাই, তাহারই নাম হইল বক্তৃতা। আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিল কিরূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও বক্তৃতার কথা বলি নাই। ১৮

রোকেয়ার চিঠিতে বিনয়ের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার করুনাবস্থায় আক্ষেপ ও বিদ্রুপ দুটোই করেছেন।

১৯২৪ সালে সিউড়ি মুসলিম বালিকা মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বেগম রোকেয়া সভানেত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভানেত্রীর বক্তব্যে তিনি পর্দার নামে কঠোর অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এছাড়া তিনি নারী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের ভ্রান্ত ধারণা ও বিরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধেও তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। সেইসাথে তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে সিউড়ির মুসলমানের উৎসাহজনক পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন।

বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী সমাজকে অজ্ঞ ও অবরুদ্ধ রেখে দেশ তথা জাতির উন্নতি হতে পারে না। তাই নারী মুক্তি আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে শত বাধা বিপত্তি তাঁকে তাঁর কর্ম থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত করতে পারেনি। অসীম ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য নারী মুক্তির অভিপ্রায়ে তিনি নিজের সকল সুখ, বিলাস ও অবসরকে বিসর্জন দিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন– যা তাঁর মৃত্যুর পরেও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীগণ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন সফল সমাজকর্মী হিসেবে এখানেই বেগম রোকেয়ার বিশাল সার্থকতা।

১৯

নারীস্থানের পল্লীগ্রামসহ সর্বত্রই অসংখ্য বালিকা স্কুল এবং নারীদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারানী বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত করেন। একুশ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হতে পারবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১২০

সমাজসেবায় রোকেয়ার কোন তুলনা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবী। অবরোধবাসিনী'র নিবেদনে তিনি হজরত রাবিয়া বসরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "ইয়া আল্লাহ! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি, তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।" রোকেয়া নিজের সমাজসেবা সমন্ধেও ঐরূপ কথা বলতে সাহস করেন বলে উল্লেখ করেছেন। ২১ যে সকল মুসলমানেরা পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াতের ব্যাখ্যা তাঁদের সুবিধামতো করে থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত জোরালো এবং সাহসী উচ্চারণে পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াতের সঠিক অর্থ ও ব্যখ্যা জানার সুস্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা নেসা'র ২৪ আয়াতের শেষে স্বামীকে স্ত্রীর হক আদায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। সূরা নূর এবং সূরা মায়দা'য় নারী পুরুষ উভয়কেই ব্যভিচার এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, অন্যথায় সমান শাস্তি। ২২

বেগম রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা না করে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে যেভাবে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। ধর্মীয় কুসংস্কার রুখে দেয়ার যৌক্তিক চেষ্টা করেছেন। শুধু টিয়া পাখির মত করে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ নয়; আরবী ভাষা শিখে পবিত্র কোরআন শরীফকে এর মূলঅর্থ সহ পূর্ণাঙ্গভাবে পাঠ করে অন্তর্নিহিত ভাব উদ্ধার ও জানার জন্য তিনি বলেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন--একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দান করেছে; ইসলাম ধর্মে নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে; স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। 'মাতার পদতলে স্বর্গ' বলা হয়েছে। আমাদের রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "তালাবুল ইলমি ফরীজাতুন, আলা কুল্লি মুসলিমীন ওয়া মুসলিমাতিন।" অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষা লাভ করা সমস্ত মুসলিম, নর ও নারীর অবশ্য কর্তব্য।

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনি ও কার্যধারার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের যে আলোকবর্তিকা বহন করে গেছেন; অন্ধকারের ঘুণে ধরা সমাজের রীতিনীতি ভেঙ্গে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় তাঁর অক্লান্ত শ্রমের ফসল আজকে আমরা ভোগ করছি। আজকে দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সেরা।

দৃঢ়চেতা রোকেয়া প্রতিকূল সমাজের মধ্যে থেকেও আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের ধারায় কর্মের যে স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন তা'ও দিনে দিনে প্রখর হতে প্রখর হয়ে বয়ে চলছে। রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশেও নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও অধিকার সুরক্ষায় কত শত সরকারি-বেসরকারি দপ্তর সংস্থা, সংগঠন গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–সরকারি পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন।

বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সমিতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ মহিলা সমিতি। এই সমিতি সমাজের অসহায় অনগ্রসর নারীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের ব্যাবস্থাসহ সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতি প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজনের মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তা করে। এছাড়া বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারী মৈত্রী কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামসহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও অনেক সংগঠন। আর এর কৃতিত্ব নারী জাগরণের অগ্রদূত, সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়ার, একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না।

তথ্য সূত্র:

১. জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, নারী মুক্তি সমকাল ও বেগম রোকেয়া, রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা, রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দুর্জয় কমিউনিকেশন, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ.০১-০২

২. তাহমিনা আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: সমাজকর্ম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদক সেলিনা বাহার জামান, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৫৯-২৬০

৩. জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.০৩-০৪

৪. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, স্ত্রী জাতির অবনতি, রচনা সমগ্র, সম্পাদনা, প্রফেসর শওকত আলী, ঝিনুক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২০০৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫

৫. স্ত্রী জাতির অবনতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৭. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বোরকা, রচনা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮- ৪৯

৮. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬১

৯. শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, সাহিত্য প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৮, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর,১৯৩৭ ,পৃ. ৫০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২

১১. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭১

১৫.শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

১৬.তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২-২৭৫

১৮. মরিয়ম রশীদকে লেখা বেগম রোকেয়ার পত্র, রচনা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

১৯. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫-২৭৬

২০. বেগম রোকেয়া, সুলতানার স্বপ্ন, রচনা সমগ্র. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

২১. বেগম রোকেয়া,অবরোধবাসিনী, রচনা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

২২. বেগম রোকেয়া, ভ্রাতাভগ্নী, প্রাগুক্ত,পৃ. -৩৩১

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং সাবেক সিনিয়র সচিব